Pandit Deendayal Upadhyaya Govt. Model College, Katlicherra
Journal of Multidisciplinary Research and Analysis
Volume 1, Issue 2 (2026)
pdugmck.ac.in/index.php/journal/

অনিরুদ্ধ ও করালী---পুণর্বিচার ও পুণর্নির্মাণ : প্রসঙ্গ তারাশঙ্করের দুটি উপন্যাস

Abstract

নতুনকে অস্বীকার না করেও পুরাতনের ওপর অসীম মমত্ববোধ, এককথায় এই হলো তারাশঙ্করের মনোভাব এবং এই মনোভাবের জন্যই তিনি অনেকের কাছে সমালোচিত—তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলো 'কৃত্রিম', 'রঙ করা' বলে অনেকেরই অভিমত যে, তাদের অবস্থান উপন্যাসের বস্তুভূমিতে নয়, বরং ঔপন্যাসিকের কল্পভূমিতে। কিন্তু তাঁর উপন্যাসগুলোকে আবার ফিরে দেখে মনে হয় কৃত্রিম', 'রঙ করা'তো নয়ই, তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলো বরং চূড়ান্ত বাস্তব। ঠিক এমনই কিছু চরিত্রের মুখোমুখি হওয়ার মানসেই আমাদের "গণদেবতা" খোলা, "হাঁসুলী বাঁকের উপকথা "শোনা এবং দুটি উপন্যাসেরই চালচিত্র থেকে বেছে নেওয়া, এমন দুটি চরিত্রকে, যারা স্বকীয়তায় মন্ডিত। এদের একজন করালী, সে সময়ের নতুন স্রোতধারাকে প্রবহমান করে দিতে চায় জীবনের ওপর, আর অপরজন পুরানো - নতুন—এই দুয়ের বহুমাত্রিক বিরোধে আন্দোলিত এক অভিনব চরিত্র অনিরুদ্ধ। আমি আমার আলোচ্য নিবন্ধে বহু চর্চিত এই দুই চরিত্রের পুণর্বিচার ও পুণর্নির্মাণ করার প্রয়াস করবো।

Souvik Bagchi

Department of Department of Bengali, Ishwarchandra Vidyasagar College, Bilonia, India
Email:momikonwar21@gmail.com
Corresponding Author*: Souvik Bagchi
Email of Corresponding Author*: bagchi.souvik2022@gmail.com

Keywords: পুণর্বিচার, পুণর্নির্মাণ, করালী, অনিরুদ্ধ, চরিত্র-বিচার

Received: *20th December 2025,* **Accepted:** *22nd February 2026,* **Published:** *28th February 2026*

নতুনকে অস্বীকার না করেও পুরাতনের ওপর অসীম মমত্ববোধ,এককথায় এই হলো তারাশঙ্করের মনোভাব এবং এই মনোভাবের জন্যই তিনি অনেকের কাছে সমালোচিত--তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলো 'কৃত্রিম','রঙ করা' বলে অনেকেরই অভিমত যে, তাদের অবস্থান উপন্যাসের বস্তুভূমিতে নয়,বরং ঔপন্যাসিকের কল্পভূমিতে।কিন্তু সত্যিই কি তাই?যদি 'তাই'ই হয়, তাহলে অবশ্য বলার কিছুই নেই।

কিন্তু মতের বিপরীতে পাল্টামত, যুক্তির পাল্টাযুক্তিকে স্বীকার করে নিলে তারাশঙ্করকে নিয়ে কিছু না কিছু বলার দায় আমাদের থাকেই। এইজন্যই তাঁর উপন্যাসগুলোকে আবার ফিরে দেখতে হয়। পাতা ওল্টাতে হয়।আর'উল্টে যখনই বোঝা যায় পাল্টে গেছে' তখন মনে হয় কৃত্রিম','রঙ করা'তো নয়ই, তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলো বরং চূড়ান্ত বাস্তব।

ঠিক এমনই কিছু চরিত্রের মুখোমুখি হওয়ার মানসেই আমাদের "গণদেবতা" খোলা,"হাঁসুলী বাঁকের উপকথা "শোনা এবং দুটি উপন্যাসেরই চালচিত্র থেকে বেছে নেওয়া,এমন দুটি চরিত্রকে,যারা স্বকীয়তায় মন্ডিত।এদের একজন করালী, সময়ের নতুন স্রোতধারাকে প্রবহমান করে দিতে চায় যে জীবনের ওপর, আর অপরজন পুরানো - নতুন--এই দুয়ের বহুমাত্রিক বিরোধে আন্দোলিত এক অভিনব চরিত্র অনিরুদ্ধ।

করালী "হাঁসুলী বাঁকের উপকথা"র হলে অনিরুদ্ধ কালজয়ী"গণদেবতা"র।

যে "গণদেবতার" পাতা ওল্টালে আমরা দেখি,গিরীশ সূত্রধর আর এই অনিরুদ্ধ কামার নিজেদের গ্রাম ছেড়ে শহরে দোকান দিয়েছে।গাঁয়ের মানুষের তাই অসুবিধার শেষ নেই। নিরুপায় হয়ে তারা পঞ্চায়েতের মজলিশ ডেকেছে।গ্রামের মাতব্বরেরা উপস্থিত। আসরে মধ্যমণি হয়ে বসে আছে ছিরু। মজলিশে বাক-বিতন্ডার শেষ নেই।কিন্তু অনিরুদ্ধের সাফ কথা---"আমরা আর ও কাজ করবো না মশায়, জবাব দিলাম। যে মজলিশ ছিরু মোড়লকে শাসন করতে পারে না, তাকে আমরা মানি না।"[১]

এর আগে পঞ্চায়েতের মুখের ওপর এমন কথা কেউ বলেনি। এখন বলছে, মানে বুঝতে হবে, সময়টা পাল্টেছে। বাস্তবিকই বিশ্বযুদ্ধের সমকালীন বাংলা তখন। পরিস্থিতি মোটেই সুবিধের নয়। এক অনিবার্য অর্থনৈতিক পরিবর্তন গ্রামীণ জীবনের ধারাটাকেই তখন পাল্টে দিচ্ছে।

গ্রামীণ কৃষিপণ্য বাইরে চলে যাচ্ছে। কারখানা জাত শিল্পদ্রব্য হু হু করে দখল করছে গ্রামের বাজার।গ্রামীণ কারিগররা স্বভূম ছেড়ে পাড়ি দিচ্ছে পরভূমে। নগদ মজুরি হয়ে উঠছে চালিকা শক্তি।কাজেই অন্য কারোর পরোয়া কেউ করবে কেন?

অনিরুদ্ধের কথাটাই পরে তাই অনেকের কথা হয়ে উঠছে। অনিরুদ্ধ যা বলেছে পরে সেটাই স্বত্ব:স্ফূর্ত ভাবে বায়েন বলছে, নাপিত বলছে, চৌকিদার বলছে, ঘাটের মাঝি বলছে---"অল্প ধান নিয়ে আমরা কাজ করতে পারবো না ", যাদের কাজ ছাড়া গ্রামীণ সমাজটাই অচল।এ যেন জোতদারের শোষণ থেকে মুক্তির জন্য গণজাগরণেরই প্রথম ধাপ।বোঝা যাচ্ছে, চিরপরিচিত গ্রামীণ জীবনে কি রকম স্পর্ধায় মাথা তুলছে'নতুন'।

এই'নতুন'কে যে তারাশঙ্কর মানেন নি, এমন নয়। কিন্তু মেনেও যা গেছে, সেই পুরাতনের ওপর তাঁর দুঃখবোধ, আমরা আগেই বলেছি।কিন্তু কোন পুরাতন? সময়ের তাগিদে জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হতে বসেছে,এর জন্যই কি তারাশঙ্করের দুঃখ? এটাই কি তাঁর কাছে 'পুরাতন' কিংবা পুরাতনের হারিয়ে যাওয়া?সমালোচকেরা যাই বলুন, নিজে জমিদার পরিবারের সন্তান হলেও, জমিদারী প্রথা বিলুপ্তির জন্য দুঃখ তারাশঙ্করের নয়।পুরাতনের'আসল তাৎপর্যও সেখানেই,

যেখানে শঙ্কিত হয়ে প্রমাদ গুনছেন তারাশঙ্কর। দেখছেন, গ্রামীণ পরম্পরা, সংস্কারের ওপর কিভাবে দাঁত বসাচ্ছে ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদ।

নইলে,জোতদার-মহজনের শোষণ থেকে মানুষের মুক্তির স্বপ্ন তিনি দেখেন নি, এমন নয়। বরং দেখেছেন বলেই অমন স্বকীয়তায় অনিরুদ্ধকে তুলে ধরেছেন তিনি। ছিরুর অত্যাচারে অতিষ্ঠ অনিরুদ্ধ। তার নামে বাকি খাজনার ডিক্রি জারি হয়েছে। জমি নিলামে উঠলো বলে। শেষমেশ জমি বাঁধা দিয়ে সে খাজনা মিটিয়েছে। কামারশালা সারিয়ে তার সুস্থ জীবনে ফেরার মুহূর্তেই আবার ঘটেছে ছিরুর আক্রমণ। প্রতিহিংসায় জ্বলে ছিরুর বাগান তছনছ করেছে অনিরুদ্ধ। অপরাধ স্বীকার করে জেলে গেছে।কিন্তু তারপর?

আমরা দেখেছি,শহরের এক গণিকার পাল্লায় পড়ে এরপর কলকাতায় উধাও হয়ে যাচ্ছে সে।কেন্দ্র থেকে ছড়িয়ে পড়ছে পরিধিতে কিংবা বলি, centre থেকে wider এ। যার শুরুটা হয়েছিল শিবকালী পুর ছেড়ে তার শহরে দোকান দেওয়ায়।আর শেষে সে হয়ে গেছে কলকাতার ফিটার--কালের এমনই পরিবর্তন!

এই কাল আর স্থান, দুইয়ের মধ্যে এক সহজ সংশ্লিষ্টতার কথা বলেছিলেন বাখতিন, যা সাহিত্যে শৈল্পিকভাবে প্রকাশিত হয় এবং একটি অপরটির সাপেক্ষে পরিবর্তিত হয়ে ক্রমে কাল যেমন নতুন হয়ে ওঠে, স্থানও তার পুরাতন বেশভুষা পরিহার করে।এইজন্যই বোধহয় কলকাতা থেকে হঠাৎ গাঁয়ে ফিরে শিবকালীপুরকে মনের সঙ্গে মেলাতে পারেনি অনিরুদ্ধ।

হ্যাঁ, সে ফিরেছিলো wider থেকে centre এ।আসলে পরিধিতে ছড়িয়ে পড়লেও কেন্দ্রের প্রতি মানুষের টান যে দুর্ণিবার। কিন্তু কালের লীলায় হিসেব উল্টে গেলে, স্থান পাল্টে গেলে পরিণামে সেটাই কখনো কখনো তার স্বপ্নভঙ্গের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেটা অনিরুদ্ধের হয়েছে।কলকাতায় গিয়ে দেদার ফুর্তিতে জীবন কাটিয়ে দিলেও, যখনই তার পদ্মের কথা মনে হয়েছে, সে গ্রামে ফিরেছে। কিন্তু তার স্ত্রী পদ্ম ততদিনে নিরুদ্দেশ। আর তার স্বৈরিণী পালিয়েছে। শিবকালীপুরের হিতু কর্মকারের নাতি তাই বেদনা নিয়েই আবার ফিরে গেছে কলকাতায়।

প্রায় এই রকমেরই ঘটনা ঘটেছিলো তারাশঙ্করের ওপর উপন্যাস "হাঁসুলী বাঁকের উপকথা"তেও।করালীর ডাকে সাড়া দিয়ে কাহারপাড়া থেকে যারা চন্দন পুরে রেলের কাজ করতে গিয়েছিলো, তারাও একসময় বালিভরা হাঁসুলী বাঁকেই ফিরতে চেয়েছে। ফিরতে চেয়েছে করালী নিজেও, মাটির টানে। অনিরুদ্ধের সঙ্গে তার পার্থক্য শুধু এই, গাঁয়ে ফিরে অনিরুদ্ধর স্বপ্ন ভেঙেছে আর করালী তার স্বপ্নকে সাকার করার সাধনা করেছে। অর্থাৎ কাল ও স্থানিক সম্পর্কের সহজাত সংশ্লিষ্টতার পরিনাম এখানে দ্বিমুখী---হয় সেটা 'বেদনা', নয়তো 'সাধনা'।কিন্তু ফলকথা সেই 'পরিবর্তন'। একটির অপরটির সাপেক্ষে ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়ে যেখানে মানুষের গতিবিধিকে নিয়ন্ত্রণ করছে।

"হাঁসুলী বাঁকের উপকথা"তেও আমরা দেখেছি,বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত কাহারদের সমাজটাকে পাল্টে দিচ্ছে। একটা শক্তির জন্ম হচ্ছে, যা কেন্দ্রাতিগ হলেও কেন্দ্র বিমুখ নয়--এরই সার্থক ব্যক্তিরূপ করালী। Centre থেকে wider এ ছড়িয়ে পড়লেও তাই তার ফেরার পথটা বন্ধ করছেন না তারাশঙ্কর। যদিও সমালোচক দের একাংশ করালীর এই ফিরে আসাটাকে খুব ভালোভাবে নেন নি। তাঁদের মতে, এরজন্যই চরিত্রটা পূর্বাপর সঙ্গতি হারিয়ে অবাস্তব হয়ে গেছে।কিন্তু আমাদের মনে হয়,করালীর ফিরে আসাটা অস্বাভাবিক ছিল না।

সর্বতোভাবে পরিবর্তনকামী করালী আসলে চেয়েছিলো কাহাররা যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলুক। এটা বুঝে প্রমাদ গুনেছে বনোয়ারী---"সে জেনেছে, বেশ বুঝেছে,এই ছোঁড়া থেকে হয় সর্বনাশ হবে কাহার পাড়ার, নয় চরম মঙ্গল হবে"[২], 'সর্বনাশ'আর'মঙ্গল', বনোয়ারীর সঙ্গে করালীর সম্পর্কটা এমনই বহুমাত্রিক। 'বহুমাত্রিক' বলেই সে করালী কে প্রত্যাখ্যান করে, স্নেহও করে। তার উত্তরাধিকারীও বানাতে চায় তাকেই।

আসলে প্রবীন বনোয়ারী, সংস্কার আর প্রথা-পরম্পরায় আনুগত্য তার প্রবল। আর করালী নতুন পথের পথিক।পুরনোর সঙ্গে এই নতুনের স্বাতন্ত্র বজায় রাখতে যুগপৎ প্রত্যাশা আর স্নেহকে লালন করে যান বলেই তারাশঙ্কর বনোয়ারীকে উপেক্ষা করেন না, আবার করালীকেও কাছে টানেন।

আর তারপরে বাস্তবের শর্ত মেনেই সংঘর্ষ হয় সময়ের সঙ্গে সময়ের।করালী হয়ে ওঠে সেখানে ভবিষ্যতের নায়ক।আর তারাশঙ্কর লেখেন --"হাঁসুলী বাঁকে করালী ফিরছে। সবল হাতে গাঁইতি চালাচ্ছে, বালি কাটছে। বালি কাটছে আর মাটি খুঁজছে"[৩] ,আসলে সে হাঁসুলী বাঁকের 'নতুন কথা' তৈরী করতে চায়। তার ফেরার পথ বন্ধ করে দিলে যে সেই'নতুনকথা'হবেনা, তারাশঙ্কর জানতেন। হাঁসুলী বাঁকের 'নতুনকথা 'তৈরীর দায়িত্ব তিনি ভবিষ্যতের ওপর দিয়েছেন।তাই ভবিষ্যতের নায়কই বালি কেটে মাটি খোঁজে। আসলে সে জীবনকে খোঁজে।

যে জীবনকে খুঁজতে গিয়ে কলকাতা থেকে শিবকালীপুর ফিরে ধাক্কা খেয়েছিলো অনিরুদ্ধ। তাই "গণদেবতা" শিবকালীপুরের উপকথা হয়নি। এই'উপকথা' হওয়া এখন যেমন শক্ত, হাঁসুলী বাঁকের'নতুনকথা'তৈরী করাটাও সহজ নয়। তারাশঙ্কর সেটা বুঝেছিলেন শুধু জীবনকে নিবিড়ভাবে দেখেছিলেন বলেই। কল্লোলের কেতাদুরস্ত ঘর থেকে বেরিয়ে গ্রামীণ জনজীবনের হাটে দাঁড়িয়ে তিনি জীবনকে দেখেছেন এবং সেই জীবনের মধ্যে যেমন অনিরুদ্ধের মতো স্বপ্নভঙ্গের বেদনাকে প্রত্যক্ষ করেছেন, তেমনি করালীর মতো স্বপ্নকে সাকার করতে চেয়েছেন।অর্থাৎ একদিকে বেদনা, আরেকদিকে প্রত্যাশা,এই দুটোকেই নিয়েছেন তিনি।কিন্তু মিলিয়ে এককাকার করেননি।

যদি মেলানোর চেষ্টা করতেন, তাহলে কালের গতি রুদ্ধ হতো, স্থান হতো constant, যা কখনই সম্ভব নয়।অতএব জীবন সম্পর্কে তারাশঙ্করের অভিজ্ঞতাই যে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলোকে অন্য মাত্রা দিয়েছে, করে তুলেছে চূড়ান্ত বাস্তব, তাতে সন্দেহ নেই।

তথ্যসূত্র

১. দ্রষ্টব্যঃ "গণদেবতা"----তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সপ্তম মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৪০৩, মিত্র ও ঘোষ প্রাইভেট লিমিটেড, কোল—৭৩ পৃষ্ঠা ৯।

২. দ্রষ্টব্যঃ"হাঁসুলী বাঁকের উপকথা" ---"তারাশঙ্কর-রচনাবলী"সপ্তম খন্ড,চৈত্র ১৩৮০,মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি: পৃষ্ঠা ২৮১।

৩. দ্রষ্টব্যঃ তদেব, পৃষ্ঠা ৪৭৮।

গ্রন্থপঞ্জী

<u>আকর গ্রন্থ:</u>

১. বন্দোপাধ্যায় তারাশঙ্কর---"গণদেবতা" --- সপ্তম মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৪০৩, মিত্র ও ঘোষ প্রাইভেট লিমিটেড, কোল--৭৩

২. বন্দোপাধ্যায় তারাশঙ্কর----"হাঁসুলী বাঁকের উপকথা "--তারাশঙ্কর রচনাবলী---সপ্তম খন্ড, প্রথম প্রকাশ, চৈত্র ১৩৮০, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কোল-১২।

<u>সহায়ক গ্রন্থ:</u>

১. দাশ ড. শেখর--"তারাশঙ্করের উপন্যাসে সমাজচিন্তা", প্রথম প্রকাশ, বইমেলা--২০০৫, অক্ষর পাবলিকেশন, আগরতলা

২. বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রী শ্রীকুমার--"বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা", সপ্তম পুণর্মুদ্রণ ১৯৮৪,মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কল-৭৩

৩.বন্দোপাধ্যায় সরোজ--"বাংলা উপন্যাসের কালান্তর", পঞ্চম সংস্করণ,নভেম্বর ২০০৩, দে'জ পাবলিশিং, কল-৭৩